দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 22 NOV 1994 ...

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

কলেজে ভর্তি সমস্যার নানা দিক

শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

সত্তর থেকে আশি শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ঢাকা বোর্ডেই পাসের হার বেশী। ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৯৯৪ সালের দাখিল ও মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এখন ভর্তির জন্য বিভিন্ন কলেজে ছুটাছুটি শুরু করছে। অনেকে মনে করছেন এবারে ভর্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দু'টি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এক. এই বিশাল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যাপাসিটিসহ কলেজ নাই। দুই. এত বেশী পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী স্টার নম্বর পেয়েছে যে এ বছর স্কলারশীপ দিতে সরকার হিমশিম খাবে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, কলেজগুলোর শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক ইত্যাদির বিচারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হলে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে না। এটা একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়টা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ সরকার শিক্ষাখাতে যে সর্বোচ্চ বাজেট ধরেছেন তাতে স্টাইপেন্ড অন্যান্য বছরের মাপকাঠিতে দিলেও তেমন বেগ পেতে হবে না। অর্থাৎ স্টাইপেন্ড দেয়াটা খুব বড় ও কঠিন সমস্যা হবে না। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে চটজলদী ঘর-দরজা, আসবাবপত্র ইত্যাদি বাড়ানো সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আরও কঠিন। শহরগুলোতে হুহু করে কলেজ গড়ে উঠছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে এ বছর যে পরিমাণ কলেজ শুরু হয়েছে বা হচ্ছে তাতে মনেই করা যায় যে, একটা বিপ্লবই শুরু হয়েছে। শহরগুলোতে কলেজ করা সহজ, কারণ সেখানে শর্তগুলো শিথিলযোগ্য। কিন্তু গ্রামের বেলায় শর্তগুলো যথেষ্ট অনমনীয় বিধায় শর্ত পূরণ করা কষ্টসাধ্য। শহরেতো ভাড়া বাড়ীতেও স্কুল-কলেজ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

ভর্তির ব্যাপারে ঢাকা শহর বা তার আশপাশের এলাকার যে সমস্যা– ঢাকা বাদে অন্যান্য শহরের যে সমস্যা– আর গ্রামাঞ্চলের সমস্যা একই ধরনের নয়। অঞ্চল ভেদেও সমস্যার বৈশিষ্ট্য পার্থক্য রয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের সমস্যা এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাও একই প্রকারের নয়।

ঢাকার সমস্যা হলো তাদের ভর্তি করাবার জন্য কলেজের অভাব। গত বছরেই ভর্তি করাতে গিয়ে সাধারণ কলেজগুলোতেও যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়েছে ছাত্র ও অভিভাবকদের। ঢাকার যোগাযোগ অবশ্যই উন্নত। ১০-১৫ মাইল দূরের কলেজে পড়ানো এ শহরে খুব কঠিন কাজ নয়। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামে যাবে না। ঢাকার ছাত্র-ছাত্রীরা ফলাফলেও একটু স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। সর্বোপরি ঢাকার অধিকাংশ অভিভাবকই সচ্ছল। তাদের কাছে গ্রামীণ মানুষের মত অভাবী চৈত্র- বৈশাখ বা আশ্বিন-কার্তিক মাস নাই। জমির ফসলের ওপর তাদের সংসার নির্বাহের কোন কিছু নির্ভর করে না। খরা বা বন্যার ফলে গ্রামীণ মানুষের মত তাদের কোন কিছু প্রত্যক্ষ ক্ষতির কারণও নাই। সুতরাং তারা ভর্তির ব্যাপারে কোন সময়ের বা কোনো পরিমাণ টাকার চিন্তা করে না। ব্যতিক্রম আছে। তবে তা উল্লেখ করার মত নয়। সুতরাং তাদের পড়ালেখা করানোর জন্য গ্রামীণ মানুষের মত কোন সমস্যা নেই। তারা ভর্তি হতে চায়– হবে। আমরা আশাকরি ঢাকা বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের ছাত্র-ছাত্রীরা যথারীতি ভর্তি হবে এবং লেখাপড়া করবে। গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তেমন কিছু আশা করা যায় না; কোন কোন গ্রামীণ এলাকায় একবারেই পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত পার্থক্যজনিত কারণে শহর ও গ্রামের চিত্রে অনেক পার্থক্য আছে। সাধারণভাবেই দেশের গ্রামের স্কুলগুলোতে বেতন ইত্যাদি বেশ কম। জানা যায় যে, গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফরম ফিলাপের সময়ে বহু অভিভাবক স্কুলের ন্যায্য ফিস প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। আর্থিকই এর মূল কারণ। অনটনের সংসারে আছে টানাপড়েন। কোনমতে তারা পরীক্ষার বোর্ড ফি দিয়েই অনেকে পাড়ি দিয়েছেন। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার প্রত্যেক স্কুলেই এক ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। পরীক্ষায় পাস করার পর তারা কলেজে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করতে আগ্রহী প্রবলভাবে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার জন্য দৌড় ঝাঁপ করতে যে অর্থ ব্যয় হয়– তাদের কাছে সে অর্থও নেই। ফলে অনেকে ভর্তির ব্যাপারে কোন পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না। গ্রামের কলেজ বা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় লজিং, মেস, হোস্টেল ইত্যাদির সংকট প্রকট। যাতায়াত সুবিধাও অধিকাংশ এমনই যে, ২/৩ মাইল রাস্তা অতিক্রম করেও পড়ালেখা করা খুব কঠিন। বিশেষ করে বন্যাপীড়িত এলাকায় বিষয়টি আরও প্রকট অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে। যাতায়াত এবং আর্থিক সংকট এই দুটোর কারণে বহু ছাত্র-ছাত্রীর আকাংক্ষার অপমৃত্যু ঘটে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের ৮০ ভাগ এলাকাই সম্পূর্ণরূপে গ্রামীণ এলাকা। এ অঞ্চলটিতে শিক্ষার পশ্চাৎপদতা উল্লেখ করার মত। সাধারণ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার হার অনুল্লেখযোগ্য। কৃষিই প্রধান পেশা। কৃষিজীবী এ অঞ্চলের মানুষ বলতে গেলে ৯০ ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের এবং ভূমিহীন। উত্তরাঞ্চলের কৃষি যে এখন প্রচন্ডভাবে মার খাচ্ছে এ কথা কারও অজানা নয়। অধিকন্তু চলতি মাসে যথারীতি বর্ষা না হওয়ায় প্রধান ফসল আমন ধান ভালভাবে হতে পারেনি। তাদের আমন ফসলের বিপর্যয়কর অবস্থা এবং রবিশস্যেরও অনিশ্চয়তার কথা ইতিমধ্যেই সরকার ও দেশবাসী ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন। খরার মোকাবিলায় সরকারকে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। ৮ জন মন্ত্রীকে নতুন ৮টি জেলার জন্য দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বলতে গেলে 'জরুরী' অবস্থাই চলছে। খোদ সচিবালয় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সর্বত্রই চলছে– এ নিয়ে জোর তৎপরতা। এলাকার ৯০ ভাগ অভিভাবকের পক্ষে এই সময়ে মাধ্যমিক পাস করা ছেলে-মেয়েদের কলেজে ভর্তি করতে ক্ষমতাই নেই।

দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষক সমাজ আমন ধান ঘরে আসা পর্যন্ত নিদারুণভাবে সংকটে থাকতে বাধ্য। অধিকন্তু আশ্বিন ও কার্তিক মাসটা এ অঞ্চলের জন্য আকালের সময়। তারা আমন ধান উঠার সময় এলে একটু স্বস্তি পাবে। ধান কাটা হলে বিক্রি করে ছেলে-মেয়েদের ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারবে। এ জন্য ভর্তির সময় বিবেচনা করে নির্ধারণ করা দরকার।

যতদূর জানি ৪টি বোর্ডের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ভর্তির সময়সীমা ফাইনসহ সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে। রাজধানী বা অন্যান্য বৃহৎ শহরগুলোর অবস্থা বিবেচনা করে এই সময় নির্ধারণ করা হলে উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের প্রতি ও তাদের অভিভাবকদের প্রতি অন্যায় করা হবে। মনে করি যে, ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর কলেজসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময়টা আমন ধান কাটার সময় পর্যন্ত বিবেচনা করা দরকার। এ ব্যাপারে নীতি-নির্ধারকবৃন্দের দূরদৃষ্টিতে সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয় বলে অনেকে মনে করেন। গোটা দেশের জন্য হলে হয়তো আরও ভাল হবে।

ভর্তির ব্যাপারে জরিমানাসহ ভর্তির তারিখটা শুরু হয়েছিলো বিদেশী শাসনামলে। দেশের সরকার দেশ চালাচ্ছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, হেলাজনিত কারণেই শুধু সময়মত ভর্তি হয় না– এটা পুরোপুরি সত্য নয়। মূল সত্য হলো– আর্থিক সংকটের কারণে অধিকাংশ দেরীতে ভর্তি ছাত্র সময়মত ভর্তি হতে পারে না। তাদেরকে ভর্তির সুযোগ দিতে আর্থিক সুবিধা দেয়াটাই স্বাভাবিক। উল্টো তাদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করাটা যে কেন হয় এটা কেউ বোঝে না। জরিমানা নিলেই যে তাদের গত সময়টা ফিরে দেয়া সম্ভব হয় না এটা কে না জানে। আজকাল ভর্তির সময়ই রেজিস্ট্রেশন ফিস ইত্যাদি আদায় করা হয়। এখানেও জরিমানা আদায় করার ব্যবস্থা করা আছে। তদুপরি শিক্ষাবিরতির প্রমার্জনের জন্যও ১৫ টাকা এবং ৩০ টাকা হিসাবে ফিস গ্রহণসহ বেশ কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। প্রমার্জন ফি, একটা সার্টিফিকেট প্রদান করা হলে কারও বিরতিকালীন সময়তো ফিরে দেয়া যায় না। তাহলে কেন আদায় করা হয়? কার স্বার্থে? এগুলো নিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভাবা দরকার। যুক্তিহীনভাবে দফায় দফায় টাকা আদায় করার কৌশল নিজ দেশে মানায় না। পড়ালেখার প্রতি সরকারের আগ্রহ অনেক উদার হওয়ার জন্যই বৃটিশ আমলের এসব অহেতুক ফিস জরিমানা রহিত করা আবশ্যক বলেও অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে শিক্ষাবিরতি প্রমার্জন ফিস, বিলম্বে ভর্তির জরিমানা, রেজিস্ট্রেশন বিলম্ব জরিমানা-আদায় করার নিয়ম বাতিল করা একান্ত জরুরী। এতে করে প্রতিষ্ঠানগুলোর হয়রানি কমবে এবং ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের ওপর একটা নির্যাতন বন্ধ হবে।

সামগ্রিকভাবে ভর্তির সময় নির্ধারণ ও অবাঞ্ছিত ফিস আদায় করার ব্যাপারে আলোচ্য প্রবন্ধে যুক্তি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন বলে সকলে প্রত্যাশা করছে।